প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা ২০১৯

চিন্তার দুর্দশা

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ধন্যবাদ দিয়ে শুরু করি। শান্তিপুর কলেজ ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক অনির্বাণ ভট্টাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগের (Film Studies) অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাস এবং আমাদের বন্ধু সংযুক্তা সিংহ যদি ১২ জানুয়ারি মনপ্রাণ দিয়ে রাত দুটো অবধি আমাকে সাহায্য না করতেন, আমি আজ আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারতাম না।

ভবেশ দাশ আমাকে প্রণবেশ সেন স্মারক বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করে বিশেষ সম্মানিত করেছেন। প্রণবেশ সেনের বহুগুণের মধ্যে একটি ছিল বহুভাবে সর্বোচ্চমানের সাংবাদিকতা: লিখিত, কথিত, দৃষ্ট। তাঁর স্মরণে এই বক্তৃতা আমি উৎসর্গ করছি বর্তমানের সেই সত্যাশ্রয়ী সাংবাদিকদের উদ্দেশে, যাঁরা বিশ্বের চিন্তার দুর্দশায় ভুক্তভোগী জামাল খাশোগি, মিয়ানমারে কারাবন্ধ

boiRboi.blogspot.com

রয়টার্সের দুই সাংবাদিক: ওয়া লোন এবং কিয় সোয় উ, যাঁরা রোহিঙ্গা গণহত্যার তদন্ত করছিলেন। এবং আমাদের দেশের নিহত সাংবাদিক, যাঁদের খোঁজ কমিটি টু প্রটেস্ট জার্নালিস্টদের নিরপেক্ষ সংকলনে নিত্যই পাওয়া যায়। একজনের নাম করতে হলে বলব গৌরী লঙ্কেশ।

এ-বক্তৃতা নিয়ে প্রথম আলাপে ভবেশ অনুরোধ করেন পশ্চিমবঙ্গ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কিছু বলতে। সে কয়েক মাস আগে। নভেম্বর মাসে নন্দন-এ বক্তৃতার পরে এক সাংবাদিক আমায় প্রশ্ন করলেন: পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ তুললেন না কেন? এই ধরনের প্রশ্ন অনেকদিন ধরে চলে আসছে। জীবনে একবারই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল: জামাইকান / মার্কিন লেখিকা জামাইকা কিনকেড-এর উপর বক্তৃতা দিয়েছিলাম। প্রথম প্রশ্ন, ভারতীয় লেখা নিয়ে বললেন না কেন? আরো অনেক উদাহরণ দিতে পারি আপনাদের। তাহলে আর আসল কথা বলার সময় থাকবে না।

প্রথম এবং সংযত উত্তর: দেশে থাকি না অনেকদিন। কিন্তু আরো একটা উত্তর আছে। যদিও নিজের দেশের জিনিসকে পড়া, তার ওপর লেখা, এবং সে জিনিস পড়ানো— এই তিন মর্মের কাজকে আমি যথেষ্ট সম্মান করি, তবুও স্বীকার করতে হবে যে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কাজের বেলায় আমার চিরকাল মনে হয়েছে কল্পনাশক্তিকে যতদূর পাঠানো যায় ততই ভালো, দেশে-দেশে মোর ঘর আছে। আর জানা মানেই তো যে-বস্তুকে জানা হচ্ছে তাকে আমার জানার শক্তি থেকে আলাদা করার দরকার আছে ইত্যাদি। এটা অবশ্যই তত্ত্বমসি— অর্থাৎ জানার egological ব্যাখ্যা। অর্থাৎ যা জানি, সেটা আমার মনের অংশ হয়ে যায়, তার উলটো। এটা নিয়ে হয়তো কোনো discussion পরে হতে পারে। কিন্তু এটা বলব যে ভবেশের অনুরোধ রক্ষা করার জন্য, এমন একটা বিষয় ধরেছি, যেটা সর্বত্র প্রাসঙ্গিক। চিন্তার দুর্দশায় জগৎ আক্রান্ত আজ। কাজেই আপনারা একটু ভেবে দেখবেন যে, প্রণবেশ সেনের যে-সুন্দর লেখাটা আমরা শুনলাম, সেটার সঙ্গে সত্যি সত্যি connection আছে বই কী। আপনারা একটু ভেবে দেখবেন। চিন্তার দুর্দশায় জগৎ আক্রান্ত। এদিকে-ওদিকে নিপাতন আছে অবশ্যই, কিন্তু তাদের সংখ্যা লঘু। আজ এই নিয়ে কথা বলব। প্রাসঙ্গিকও হবে, আবার দূরে দৃষ্টিপাতও করা যাবে।

যাঁরা আমার কলকাতার গত দুটি বক্তৃতায় এসে আমাকে বাধিত করেছেন, তাঁদের বলে রাখি যে আজকের কথাগুলি সেই দুটি ভাষণের সঙ্গে জড়িত থাকবে। প্রথম ছিল 'গণতন্ত্রের রহস্য' (শুধু আমি ও আমার অধিকার নয়, সম্পূর্ণ অন্যরকম লোকেদের সঙ্গে

সমতাবোধ), তার পরেরটা ছিল 'যুক্তি ও কল্পনাশক্তি' (কল্পনাশক্তি যুক্তিকে রক্ষা করে), এবং সেই দুটির সঙ্গে এক রেখায় আজকের বক্তব্য: যখন চিন্তাধারায় এই রহস্যগুলি স্থান পায় না, তখনই চিন্তা দুর্দশাগ্রস্ত হয়। এখানে বলা দরকার যে, কল্পনাশক্তি এই অর্থে একটি শক্তি। শুধু উড়িয়ে দেওয়ার মতো অসত্য নয়। এটা নিয়ে আরো বলা যায়। কিন্তু আগে একবার বলেছি। সুতরাং, যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁদের হয়তো মনে পড়বে।

এই সাবলীল বলিষ্ঠ কল্পনাশক্তি নিজেকে ছেড়ে, অন্যের এবং অন্য গোষ্ঠীর অন্তর্গত হতে চেষ্টা করে অন্তরে অন্তরে। একক এবং বহুজনীন অন্তরে। এই পারদর্শী কল্পনাশক্তি যখন মৃতপ্রায়, আত্মমুখী, যুক্তিকে রক্ষা করতে অক্ষম, তখন গণতন্ত্রের সেই অন্তর্নিহিত রহস্য— আমি নই অধিকারের মালিক শুধু, অপরের অধিকারের জামিনও আমি, এ-চিন্তা হারিয়ে যায়। ভীরু দুর্বল চিন্তায় যখন এই-রহস্য কল্পনা করা যায় না, তখন সব আমি, সব আমার— আমার স্বামী, আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার সংসার। অভাবে স্বভাব নষ্ট, সুতরাং, গরিব মানুষকে অপরের কথা চিন্তা করতে বলা উচিত নয়, এসব কথা আমাকে বলে লাভ নেই। আজ চল্লিশ বছর আমি এই সমস্যার নিত্য সম্মুখীন, হাতে-কলমে। এবং যাঁরা ভোট দেন তাঁরা যতই গরিব হোন না কেন, তাঁদের এই 'আমি বা আমরা শুধু নই,

অপর এবং অপরেরা'— এই চিন্তা করতে পারতে হবে। কেননা তাঁরাও গণতন্ত্রের রক্ষক। নইলে তাঁরা শুধু গণতন্ত্রের পাটিগণিত অর্থাৎ ভোট গোনার উপায়। এবং এই পাটিগণিত কীভাবে সুরক্ষিত হয়, কত হুমকি, কত জোর দেখানো, কত খুনোখুনির মাধ্যমে— তার অভিজ্ঞতাও আমার হাতে-কলমে। সেইজন্যই নন্দন-এ ভদ্রলোকী বামপন্থাকে বিদ্রূপ করে বলেছিলাম: 'ভোটের কল চলে অন্য তেলে।' এ-সমস্যার সমাধান গরিবদের গণতন্ত্রের অধিকার দিতে নারাজ হয়ে নয়, আয়ের ভারসাম্য বজায়ের অর্থাৎ redistribution-এর দিকে হাঁটি-হাঁটি পা ফেলে। কিন্তু সে-সমাধান অসম্ভব আজ। কেননা দুর্দশাগ্রস্ত চিন্তা 'আমি, আমার' ছাড়া এগোতে পারে না। এই সমস্যার নাম দুষ্টচক্র অথবা vicious circle।

একটা পুরোনো লেখায় শঙ্খ ঘোষ এই মর্মে টয়েনবী থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন নিজের বাংলা তর্জমায়: 'বিজ্ঞানে বা তথ্যপ্রযুক্তিতে সামগ্রিক প্রগতি সম্ভব, কিন্তু সামূহিকভাবে সামাজিক বা আত্মিক বলে কিছু আর হতে পারে না।' সাহিত্য বা প্রবন্ধে, রূপকের মাধ্যমে শঙ্খ তার সমাধান দেখিয়েছেন। কিন্তু আমার কাছে, কাজে-কর্মে সেই সামূহিক সমাধানের কোনো আশা নেই। কেননা সাহিত্য বা প্রবন্ধ অবধি নিম্নবর্গের দৌড় নেই। উচ্চবর্গের দৌড় যাচ্ছে digital জগতে।

কোথাওই কোনো দৌড় রূপকের দিকে নেই। আশা আছে, এই ভেবে এগোনো উচিত, কিন্তু আশা নেই, এটা বিলক্ষণ জেনে। এর মধ্যে— এখনো শঙ্খকেই উত্তর দিচ্ছি— আমি কোনো দুঃখ দেখি না, দেখি শুধু বাস্তবিকতা। এবং আমি এই বাস্তবিকতার পরিপ্রেক্ষিতেই বাকি কথাগুলো বলব আজ সন্ধ্যায়। আশা নেই চিন্তার আত্মমুখী দুর্দশার হাত এড়ানো সামগ্রিক বা সামূহিকভাবে, কিন্তু আশা আছে, এই ভুল-ভাবনার ওপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে। এখান থেকে সহজেই আমি ফরাসি উচ্চতত্ত্ব French high theory অথবা আমার পেশাগত কাজে যেতে পারি এবং বলতে পারি: reason is the best grounding error— যুক্তিযুক্ত ভুলের উপর দাঁড়িয়ে কাজ করবার কথা তুলে। এ-নিয়ে অনেক লিখেছি, এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে IIT দিল্লির Sanil V, এই কর্ম ও চিন্তা-পদ্ধতির বড়ো সুন্দর ব্যাখ্যা করেছে। কিন্তু এ-সভায় সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে। যদি কারো আগ্রহ থাকে, সেই কারণে বললাম। যুক্তিযুক্ত ভুল-ভাবনার ওপর নির্ভরশীলতা, স্থায়ী কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ভঙ্গি।

১৮৪৭ সালে কার্ল মার্ক্স *Misère de la philosophie* অথবা দর্শনের দুর্দশা বলে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। আপনাদের মধ্যে কেউ-কেউ হয়তো শুনতে পেয়েছেন আমার শিরোনামায় সেই শিরোনামার

প্রতিধ্বনি। যদিও এটি মার্ক্স-এর সর্বশ্রেষ্ঠ লেখাগুলির মধ্যে একটি নয়, তবুও লেখাটি পরবর্তীকালে অন্তত দুজন চিন্তককে উদ্বুদ্ধ করেছে। মার্ক্স-এর প্রবন্ধটি ফরাসি চিন্তক পিয়ের যোসেফ প্রুদঁ-র একটি বই-এর প্রত্যুত্তর। বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এই ছাঁদে দুটি জোরালো বই বেরোয়: প্রথমটি ইংরেজ ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী ই পি টমসনের *পভার্টি অফ থিওরি*। এতে টমসন ফরাসি দার্শনিক আলথুসরকে সমালোচনা করেছেন বাস্তবকে অগ্রাহ্য করার কারণে। টমসন মার্ক্স-এর প্রবন্ধটিকে দাম দিয়েছেন। তাঁর বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে একটি আমি তুলে ধরলাম: টমসন আমাদের সমাজের অবয়বকে বোঝবার নির্দেশ দিয়েছেন। মানসিক কিছু নয়। সমাজের অবয়ব, শরীর। লিখেছেন, 'সমাজের অবয়বে সকল অর্থনৈতিক সম্পর্ক একাধারে বজায় থাকে, এবং একে অন্যকে মদত করে (১৪৬)।' টমসন-এর বক্তব্যের সঙ্গে আমার অভিযোগ এক— গোলোকায়নের আলিঙ্গনে, চিন্তায় দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের শরীরে শুধু 'আমি, আমার'— অপরের চিন্তা, অন্যদের মদত দেওয়া অসম্ভব। এইজন্যই নন্দন-এ বক্তৃতায় বলেছিলাম, 'লোভে লাভ, আর একের লাভে সমূহের মৃত্যু।' টমসনও চিন্তার দুর্দশার সম্পর্কে এভাবেই আক্ষেপ করেছেন। তিনি একটি 'conceptual lethargy' অর্থাৎ, মোটামুটি, 'ধারণার ক্ষেত্রে ঝিমুনি'-র উল্লেখ করেছেন। এবং আরো লিখেছেন যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সে ঝিমুনি আজ আমাদের মগজের উপর যথাযথ প্রতিশোধ নিচ্ছে।' আজ থেকে চল্লিশ বছর আগেই তিনি জগতে চিন্তার দুর্দশার খোঁজ পেয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য আলাদা। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে টমসনের তত্ত্ব ধারণার মধ্যেই আটকে রইল, ধারণার ঝিমুনি কাটাতে কল্পনাশক্তির ভূমিকার দিকে তিনি গেলেন না। এইখানেই Bolivian লেখক Zavaleta (Rene Zavaleta Mercado) অদ্বিতীয়। তাঁর সম্পর্কে তো বেশি কিছু বলতে পারব না, কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখবেন কত তফাত জাভালেটা আর টমসনের মধ্যে।

আমার মতে এবং অভিজ্ঞতায় এই অপরাশক্তি কল্পনার সাহায্যে অপরের অন্তরে প্রবেশাধিকার অর্জনের প্রয়াস, সাধারণভাবে অমানুষিক। বলে কোনো লাভ নেই গায়ত্রী অপরা শক্তি কথাটি অপপ্রয়োগ করছে। সহজে সে অভিযোগ এড়ানো যায়, ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে আছি বলে। কিন্তু ওই কঠিন পদ্ধতি অথবা প্রণালী, জেনে-বুঝে ভুলের ওপর দাঁড়িয়ে সক্রিয় চিন্তা ও কাজকে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া, সেটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক নয়। এমনকী বছর পাঁচ-ছয় আগে, যখন আমি প্রথম মনে করি, ethics-এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে 'নীতি' বর্জনীয়, তখন আমার তারাদিদিকে, সামনে বসে আছেন সংস্কৃতজ্ঞ দার্শনিক ড. তারা চ্যাটার্জি এবং অরিন্দম চক্রবর্তীকে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলাম 'অপরাশক্তি'-র মানে। দুজনে, আলাদা আলাদাভাবে, মোটামুটি একই কথা বলেছিলেন যে, 'পরাশক্তি'-র মানে সুসমঞ্জসভাবে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু 'অপরাশক্তি' ব্যঞ্জনার রাজ্যে, তার খুব ঝাড়াপোঁছা মানে নেই। এক বিদগ্ধ শ্রোতা মনে করেছেন, আমি এই দুটি ধারণাকে আলাদা করছি। আমার ইচ্ছে তা নয়। আমি শুধু বলছি, 'অপরাশক্তি'-র মানেটা যখন definitive নয়, আমি তাকে আমার বাসনা দিয়ে অধিকার করলাম। ফ্রয়েডের ভাষায় 'hypercathexis'।

তখন আমি 'অপরাশক্তি'-র ওপর ভর করলাম। আমাদের কাছে ethics unconditional, অর্থাৎ সে সর্বব্যাপী, সে অকারণ, অহৈতুকী, আমাদের ধরে রাখে। আমরা যদি তার নাড়া খেতে শিখি, ধাক্কা ধরতে পারি, তবে সেটা ধরা পড়ে আমাদের মাপসই হয়। তখন হয়ে যায় নীতি, কর্তব্য, দায়িত্ব, যুক্তিসাপেক্ষ। কিন্তু তাড়াটা অহেতুক। সেটা ধরতে জানতে হবে। তার জন্য তৈরি হতে হয়, বহু প্রয়াস করতে হয়। কল্পনাশক্তির প্রয়াস। আমার পেশাগত ভাষায় আমাদের মাপসই করার কাজগুলির নাম— responsibility, accountability— ভালোমন্দের যোগ-বিয়োগ। বহুকাল আগে, জুরিখে উদ্‌বাস্তু পালনের দায়িত্ব বহন করার সমর্থনে বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রিত হয়ে, আমি মুসলমান অল্ হক্ অথবা আমাদের 'হক' কথাটা বোঝবার চেষ্টা করতে বলেছিলাম

সুইস ধর্মশালার মালিকদের— কেননা উদ্‌বাস্তুদের মধ্যে তাঁদের কাছে সাধারণত সবচেয়ে ভীতিপ্রদ ছিল মুসলমানেরা। হক্ যেখানে জন্মস্বত্ত্ব, শুধু কর্তব্য, অথবা 'সব ঠিকঠাক'— এই মর্ম নয়, তা চিন্তা করতে বলেছিলাম, কেননা ওপর থেকে দয়াবৃষ্টি যেটা তাঁদের কাজের ধরন, তা চিন্তার দুর্দশাকে বাড়ায় বই কমায় না।

কিন্তু ধর্ম আমার পেশাগত বিষয় নয়, শুধুই ক্ষেত্র বুঝে জুরিখে কথা তুলেছিলাম। আর নন্দন-এর বক্তৃতায় ক্ষেত্র বুঝে কাজ করবার কথা বহুবার বলেছিলাম। আমি পেশা অথবা discipline-কে সম্মান করি। যাঁরা ফরাসি ঐতিহাসিক মিশেল ফুকোর নজির দেখিয়ে discipline-কে সম্মান করার জন্য আমার দোষ ধরবেন, তাঁদের বলে রাখি যে, ফুকোর সমালোচনার বিষয় discipline নয়, ওটা অনুবাদের মুশকিল। ফরাসিতে ফুকোর কথাটা 'surveiller', অর্থাৎ কড়া নজরে রাখা।

সুতরাং, ধর্ম আমার পেশাগত বিষয় নয় বলে জগতের বহু ধর্মের, এমনকী আমাদের দেশের বহু ধর্মের, আনাচকানাচ আমি জানি না। কিন্তু প্রগতিশীল হিন্দু ঘরে জন্ম হওয়ার দরুন, ডায়োসেশানে মিস পাইনের মনপ্রাণ দিয়ে সংস্কৃত শেখানোর দরুন, এবং বিমল মতিলালের সঙ্গে মহাভারত পড়ার দরুন, এইটুকু বলতে পারি: ধারনাৎ ধর্মম্ ইত্যাহু ধর্মম্ ধারয়তে প্রজাঃ।

'প্রজা' বলতে সৃষ্ট জীব, শুধু মানুষ নয়। এই বাক্যে বিভিন্ন বাচ্যের ব্যবহার সম্পর্কে আমি বিজ্ঞভাবে কিছু বলতে পারব না। শুধু বলি যে এখানে unconditional ethics— ধারণ করাই ধর্ম এবং প্রাক্-মানবিক, প্রজার বৃহত্তর অর্থে নীতি অথবা নিয়ম (ধরুন 'নিয়মরাজা' অর্থে) একাধারে বলা হয়েছে। এবং বর্তমানে সমাজের সর্বোচ্চ স্তর ধর্মকে নিয়মের সর্বনিম্ন অর্থে নামিয়েছে। কাজেই 'ধর্ম' কথাটি আজ ন্যায়সম্মত সমাজের প্রেক্ষিতে ব্যবহারযোগ্য নয়। এবং ১৯৪৬-এর রায়ট ভাসা-ভাসা মনে আছে। আমরা ঠিক সৈয়দ আমীর আলি আর ওল্ড বালিগঞ্জ রোডের কোণাটায়, যোগ হয়েছে যেখানে, সেখানে থাকতাম। সুতরাং, সেইজন্যই এখনো ভাসা-ভাসা মনে আছে। ছোটোবেলায় মাথায় ঢুকে গেছে যে ধর্মের এই ব্যাপকতার জন্যই কল্পনাশক্তির অপব্যবহারে তা পৌরধর্ম অথবা politics-এ পর্যবসিত হয়। অহৈতুক প্রেমের বদলে অহৈতুক রক্তপাত ঘটায় এবং কখনো রাজনীতির সমর্থন পায়। কাজেই আমি অবিশ্বাসী এবং কোনো ধর্মের কাছে সাহায্য চাই না।

কিন্তু, 'অপরাশক্তি' কথাটির মধ্যে অবশ্যই হিন্দুধর্মের ছোঁয়া আছে। এবং মানে-খোলা কথা অবশ্যই বিপজ্জনক। এখানেই আমার দায়, অর্থাৎ task, শিক্ষকের দায়। মাইনে-করা শিক্ষক। এ-কথায় দর্শনের আলিঙ্গনটাকে বড়ো করে কথাটার সাধারণ মানে

'অপরের দিকে ঝোঁকা' অথবা অপর-ধরনের শক্তিকে মুক্তি দাও, এবং খোলা মানেকে অহৈতুকী ধারয়িত্রী ethics অর্থ দিয়ে ভরাতে দাও। এই কথা আমি নিজেকে বলতে বাধ্য। কাজেই বলতে পারেন, ethics-কে অপরাশক্তি বলা একটি সৃজনশীল অনুবাদ। এবং সৃষ্টির কাজটা সকল অনুবাদের দায়। আমি অনুবাদতত্ত্ব সম্বন্ধে বহু লিখেছি। আমি সেটাকে একটা সক্রিয় কাজ বলে মনে করি। just একটা convenience বলে মনে করি না। এখানে অনেকেই মনে করেন, ইংরেজি থেকেই সবকিছু অনুবাদ করা যায়। এটা ঠিক নয়। আমি এ-সম্বন্ধে অনেক লিখেছি। কেউ হয়তো পড়েও থাকবেন। তার সঙ্গে মিলিয়ে নিন। আর un-conditional ethics, যার ঢেউ লাগলে দুর্দশাগ্রস্ত চিন্তায় আমরা বুঝতে পারি না, ধাক্কা ধরতে পারি না, তার অপরাশক্তি নামকরণ করতে আমাকে অনুমতি দিন। সেই শক্তি মানুষের মাপসই হয়ে যখন নীতি হয়ে যায়, তখন আমরা বুঝি morality অথবা Sittlichkeit, যা দিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা ভালোমন্দ বিচার

*Dionysius Longinus or Pseudo-Longinus, (flourished 1st century AD), name sometimes assigned to the author of 'On the Sublime', one of the great seminal works of literary criticism. The earliest surviving manuscript from 10th century.

করি এবং করার দরকার আছে। সেখানেও দুর্দশা; কিন্তু সেখানে আমি যাব না আজ সন্ধ্যায়।

শঙ্খর সাথে আমার আলোচনা আমি সর্বজনীনভাবে আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। উচ্চমানের লেখার প্রসঙ্গে লঞ্জাইনাস* দু হাজার বছর আগে বলেছিলেন, জগতে অসাধারণ ব্যক্তি আছেন, যাঁরা নিজগুণে উচ্চমানকে— অপরূপকে— ধরতে পারেন। সাধারণ লোকে পারে না— এবং আমি, লঞ্জাইনাস, সেই সাধারণ লোককে অপরূপ ছোঁয়ানোর জন্য বই লিখছি। আর আমার, গায়ত্রী স্পিভাকের, লক্ষ্য এমনই গোষ্ঠীর প্রতি, যারা হাজার বছরের অশিক্ষা এবং বর্তমানের কুশিক্ষার জন্য বই ব্যবহার করতে শেখেনি। এবং, ওপরে যারা digital idealism এবং অহংকারে বই আর ব্যবহার করতে পারে না। সুতরাং বই লিখেও লাভ নেই। লঞ্জাইনাসের সঙ্গে অবশ্য আমি চিন্তায় একমত। জগতে অসাধারণ ব্যক্তি আছেন যাঁরা আপনা থেকে অপরাশক্তি চিন্তা অথবা ধারণ করতে পারেন। তাঁরা আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকুন। বৈপরীত্যে শিক্ষকের কাজ, সাধারণের কল্পনাশক্তিকে খাটিয়ে শক্ত করা— চিন্তা অর্থাৎ মাথা সত্যি-সত্যি খাটাতে পারার জন্য যে হৃদয় খাটানোর দরকার আছে, তার প্রস্তুতি তৈরি করা। বর্তমানে তা আর সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ অসাধারণ ছিলেন। এবং ছিলেন

সারদামণি চট্টোপাধ্যায়। আমি এই দুজনকে ছুঁয়ে তারপর আবার আমার মূল বক্তব্যের খেই ধরব। অসাধারণ রবীন্দ্রনাথকে ধরে শঙ্খ ঘোষ দেখিয়েছেন 'আমি আমি' চিন্তা আর অপর-চিন্তাকে কী করে আলাদা করা যায়। 'আমার জন্য, কাছের জন্য, শরীরের জন্য চাওয়া— বাসনা। সবার জন্য, দূরের জন্য হৃদয়মনের জন্য চাওয়া— আকাঙ্ক্ষা।' কোনো ধারণাকে দু-ভাগে ভাগ করে বোঝা হচ্ছে তাত্ত্বিক ধরন।

কিন্তু আমাদের লক্ষ্য আসল দুনিয়া বদল। শুধু তত্ত্বে সত্য না মেলে, কারো কারো মনে থাকতে পারে, এই গানটা লেখা হয়েছিল মার্ক্সের মৃত্যুর ১০০ বছর পরে। মার্ক্স / এঙ্গেলসের ফৈয়ারবাকের উপর একাদশ সূত্র: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden *interpretiert*, es kommt aber darauf an, sie zu *verändern.* আমাদের লক্ষ্য আসল দুনিয়া বদল, শুধু তত্ত্বে সত্য না মেলে। শঙ্খ আর আমি দুজনেই উচ্চশিক্ষিত, শঙ্খ অসাধারণও বটে। আমরা বাসনা / আকাঙ্ক্ষার তফাত ভাগ করে বুঝব। সেটা তাত্ত্বিক সত্য। কিন্তু দুনিয়া বদলের জন্য যে সত্যের দরকার আছে, তাতে একটু ভুল করতে হয়। তাত্ত্বিক বিভাগকে একাকার করে ছাত্রের মনের গহনে যা আছে, সেগুলোকেই গুছিয়ে ওই এক-আকারে সাজানোর চেষ্টা করে চলতে হয়। ওই যে আমি বলি

না, rearrangement of desire। মানুষের মন সহজে বদল করা যায় না। যে বাসনা আকাঙ্ক্ষা আছে, তাকে গুছিয়ে রাখা যায়। এটুকু বলতে পারি এতকাল পড়িয়ে। এই তো চিন্তাকে দুর্দশা থেকে মুক্তি দেয়ার উপায়। অবহেলিত নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষ, অথবা বিলাসে নষ্ট উদ্ধত ভদ্রলোক-বড়োলোক সাধারণ মানুষের মনের গহনে ঢোকার চেষ্টা সফল হয় না দিনের পর দিন, এবং ডিজিটালের তাড়না ওপরের তলার সাধারণ মানুষের মনের দরজায় 'প্রবেশ নিষেধ' টাঙায়। কিন্তু তবু করা যাবে, এই ভুল ধারণা নিয়ে এগোতে হবে, আগে বলেছি। এবং অসাধারণ শঙ্খ ঘোষ এই করার পথ দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভাষা প্রয়োগে— যেখানে তিনি বুঝিয়েছেন, তাঁর ব্যাখ্যায়, তিনি বাসনা, আকাঙ্ক্ষা— দুটোকেই বলেছেন চাওয়া। একাকার করেছেন। তিনি বাসনা আকাঙ্ক্ষা দুটোকেই বলেছেন 'চাওয়া'। কর্মক্ষেত্রে বছরের পর বছর ওপরে এবং নীচে ছাত্রছাত্রীর মানসিকতার গহনে ঢোকবার বেশিরভাগটাই অসফল (বৃথা নয়)। চেষ্টায় এইটুকু (হয়তো ভুল) বুঝেছি যে একাকৃত চাওয়াকে ঠিকভাবে গুছোনো আমাদের শক্ত কাজ, যাতে উৎপাদনের শক্তি, forces of production ও উৎপাদনের সম্পর্ক, relations of production বদলানোর দুষ্টচক্রকে বিরক্ত করা যায়।

আমি লিখেছি যে আমার মতে এবং অভিজ্ঞতায়

অপরাশক্তি সাধারণভাবে অমানুষিক। এবং লোভ স্বাভাবিক। আরো বলব, চাওয়ার এই ধরনগুলিকে অন্যভাবে গুছিয়ে সাজিয়ে উৎপাদনের সম্পর্ককে নাড়া দিতে হলে শুধু অহংবাদিত্ব করলেই চলবে না, সামূহিকভাবেও শিক্ষা দিতে শিখতে হবে। অসাধারণ কবি বলতে পেরেছেন, 'ছাড়তে-ছাড়তে বাড়তে-বাড়তে মরতে-মরতে বাঁচতে- বাঁচতে আমি কেবলই হব।' 'মানে কী?' শঙ্খ ব্যাখ্যা করেছেন, 'মানে এই যে, ব্যক্তি-অংশটাকে যতটা ছাড়তে পারি আমি, ততটাই বেড়ে উঠি বিশ্বের দিকে।... আমার স্বার্থ অংশটা যতখানি মরে, ততই বেঁচে ওঠে আমার বিশ্বতামুখ আমি।'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আমি'। এটাকে 'তোমরা'-য় পরিবর্তন করতে যে শিক্ষাপ্রকল্প, সেখানে তাঁর নিজের চাওয়া অবাস্তব ঐতিহ্যকল্পনা ও শ্রেণিদোষে সফল হতে পারেনি। এতে আমি রবীন্দ্রনাথকে ছোটো করছি না। মনে যেন থাকে, নন্দন-এর বক্তৃতায় বলেছিলাম যে মার্ক্স প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক নিজে স্থাপন করতে পারেননি। সে-কথা যখন বলেছি, তখন তাঁর চিন্তাটাই প্রমাণ হয়েছে। শ্রেণিবিভেদে আবদ্ধ ছিলেন তিনি।

এবারে যাই সারদামণি চট্টোপাধ্যায়ের কথায়। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পাননি, নিরক্ষর ছিলেন। প্রচলিত নিয়মে তাঁকে সম্পূর্ণ মাতৃরূপায়িত করা হয়েছিল, এবং

সেই প্রচলন অনুযায়ী তিনি নিজেও গভীর স্নেহের সঙ্গে 'আমি সকলের মা' ইত্যাদি বলেছেন। কিন্তু যখন গুরু হিসেবে, নেতা হিসেবে কথা বলেছেন তখন অহৈতুক অপরাশক্তির ঢেউয়ে ভেসে কথা বলেছেন, তথাকথিত 'মহিলাসুলভ' আবেগ ছাড়াই। এমনকী মাতৃভাবের ভিতর থেকে গণতান্ত্রিক অপরাভাবের ব্যবহার তিনি করেছেন— অর্থাৎ, আমার চেয়ে একেবারে অন্য ধরনের লোকের এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে সমান অধিকার— যথা: 'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। ভয় পেয়ো না। দুঃখ হলে বলবে, আমারও মা আছে।'

এই তো unconditional ethics— অহৈতুক প্রেম। মাতৃভাবকে সমালোচনা না করে— তিনি বুদ্ধিজীবী ছিলেন না কিন্তু প্রখর বুদ্ধি ছিল, সমালোচনা করতে জানতেন— একাকার করে দিলেন সন্তানসমাজকে, যেমন শঙ্খ দিলেন 'চাওয়া'-য়। আছ তোমরা— পাজি হও, বদমাশ হও, আবার ভালোও হতে পারো। সৎ বা অসৎ। সকলের দুঃখের সময়ে, যেমন খুশি দুঃখ, বলবে: 'মা আছে ভয় পেয়ো না।'— সামূহিক। আবার ঐকিকও বটে— দীক্ষা দিতেন। আমার বাবাকে দিয়েছিলেন। সে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিতৃদেব নীরব ছিলেন। আমার তেরো বছর বয়েসে তিনি গত হয়েছেন, কিন্তু দেখেছি তাঁর ভিতর অপরাশক্তির বিকাশ। সে গল্প এখন স্থগিত রাখতে হবে, আত্মজীবনী লেখার ফুরসত হলে, পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানবেন কোনোদিন।

এবং শঙ্খ ঘোষ কবিতার ধাক্কায়, জ্ঞানের ধাক্কায়, রাবীন্দ্রিক রূপকের ধাক্কায়, পথে বেরোন এখনো সামূহিক আগ্রহে, আন্দোলনে। ২০০৭ সালে আমার মাসতুতো ভাই, ক্যালিফোর্নিয়া-র প্রখ্যাত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এবং একতারাবাদক সৌম্য চক্রবর্তী আমাকে ই-মেল করে একটা লেখা পাঠিয়েছিল, গায়ত্রীদিদি, পড়ো পড়ো বলে। কেন জানি না, ২০০৭-এর ভূরি-ভূরি ই-মেল আমি পড়িনি, উত্তর দিইনি। বর্তমানে, পুরোনো ই-মেল ঘাঁটছি, গুছোচ্ছি। ২০০৭-এর ১৪ নভেম্বরের ঘটনা, কলকাতার রাস্তায় নেতাবিহীন এক লাখ লোকের মিছিল। উল্লিখিত লেখাটি আমি পড়লাম ২৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে। একদিক দিয়ে ভালোই হল, সামগ্রিক উচ্ছ্বাসে যে চিন্তার দুর্দশা দূর হয় না, তা আবার প্রমাণ হল। কিন্তু উচ্ছ্বাস ও ধিক্কারেরও ভূমিকা আছে দুর্দশা দূরের চিন্তায়।

লেখাটা লিখেছিল সৌম্যর বন্ধু মৈনাক বিশ্বাস, ওই মিছিল নিয়ে, 'কাফিলা' নামক ব্লগে। মৈনাকের সঙ্গে আমার আলাপ ২০০৯-এ। ওই ব্লগ পোস্টের তারিখে আমি মৈনাককে চিনতাম না। প্রথমে একটি বাক্য উদ্ধার করছি মৈনাকের মূল ইংরেজি লেখা থেকে; তারপর আমার তর্জমায়: 'It wasn't possible to form the usual semi circle of spectatorship around a single voice. Was it Mahasweta Devi speak-

ing or Sankha Ghosh? Aparna Sen or Joy Goswami? Was it Pratul Mukhopadhyay singing?'। অনুবাদ: 'সাধারণত যেমন হয়, সেই ভাবে একটি গলার আওয়াজ কেন্দ্র করে দর্শকবৃন্দকে অর্ধবৃত্তে সাজানো সম্ভব ছিল না। মহাশ্বেতা দেবী বলছেন, না শঙ্খ ঘোষ? অপর্ণা সেন না জয় গোস্বামী? ওই কি প্রতুল মুখোপাধ্যায় গান করছেন?' মৈনাকের লেখায় এক থেকে সমূহে একাকৃত হয়ে গেলেন শঙ্খ! মৈনাক, জেনে বা না-জেনে, কেমন কৌশলে একাকারটাকে কল্পনাসমৃদ্ধ চিন্তার গণ্ডির মধ্যে এনেছে স্ত্রী-পুরুষের গলাকে এক করে। মহাশ্বেতাদির গলা আর শঙ্খের গলা মোটেই ভুল করা যেত না। যায় না অপর্ণা সেনের আর জয় গোস্বামীর, যদি শুনে থাকেন তাঁদের কথা। এবং প্রতুল মুখোপাধ্যায় এমনভাবে গান করেন যে তাঁর গাওয়াটা অন্য কারুর গাওয়া বলা মুশকিল। এগুলি বাস্তবিক, অথবা আক্ষরিকভাবে দুই এককের তুলনা নয়, শক্ত কল্পনায় এককের একাকারিত্বের বর্ণনা।

এবারে আবার খেই ধরি। মার্ক্স-এর 'দর্শনের দুর্দশা'-র অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ প্রথম প্রবন্ধ ছিল ই পি টমসনের 'তত্ত্বের দুর্দশা'। এবার দ্বিতীয় প্রবন্ধটি তুলে আনি— ব্রিটানির লুস ইরিগারায়-এর লেখা Misère de la psychanalyse। এতে ইরিগারায়, নিজে মনঃসমীক্ষক, অর্থাৎ, psychoanalyst, পুরুষাঙ্গ-প্রধান

দুর্দশাগ্রস্ত মনঃসমীক্ষাতত্ত্বকে সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন, যে তাঁরা নারীকে প্রথমে অপরা বানিয়েছেন এবং তারপর সেই অপরাকে স্বার্থে অপহরণ করেছেন। এখানে মৈনাক বিশ্বাসের লিঙ্গভেদকে অস্বীকার না-করে, অসম্ভাব্য সাদৃশ্যের উপস্থাপনায় স্ত্রী-পুরুষ একাকার করা, জেনে করেছেন, না, না-জেনে করেছেন জানি না, অবহেলায় করেছেন। এই কাজটি ইরিগারায়ের কঠিন পরীক্ষায় হেলায় সফল হবে।

পুরুষাঙ্গ প্রাধান্য— জগতের সর্বত্র প্রাসঙ্গিক। ওপরে-নীচে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সব মাপের লোকেদের মধ্যেই। অধিকাংশ মেয়েরাও পুরুষাঙ্গকেন্দ্রিক চেতনা অথবা অচেতনা নিজেদের মধ্যে জাগিয়ে রেখেছেন। আমি বীরভূমের গণ্ডগ্রামেও বলি যে এই অবমাননা আমাকে অবধি বহন করতে হয়, এখনো এই অচেতনায় পরামর্শ পাই, বিধ্বস্ত স্বতন্ত্র জীবনের জন্য পাই লিঙ্গসুলভ সহানুভূতি! চিন্তার দুর্দশার বর্ণনা ইরিগারায় দিয়েছেন যান্ত্রিক মন বলে, যে-মন লিঙ্গভেদের মাধ্যমে পুরুষের সত্তা বোঝে, যে মন মহিলাকে সংস্কৃতির ধারয়িত্রী, বাড়ির চাবির মালিক ইত্যাদি বলে, তাদের ঠেলে দেয় গোনাগুনতির জগতে, যেখানে কলহপ্রবণতা ছাড়া তাদের আর কোনো গতি থাকে না। কোটি-কোটি 'সাধারণ' মহিলাদের কথা হচ্ছে, ভদ্রলোকী গার্গী-মৈত্রেয়ীদের এ-সভায় দাঁড় করানো চিন্তার দুর্দশার প্রমাণ। বিমর্দিত দক্ষিণ ভারতীয় খনাকে

বরং সাধারণ-অসাধারণের মানে ফেলা যায়।

আমাকে যা-বলতে অনুরোধ করা যায়, তাই বলবার চেষ্টা করি। তাই বারবার ভবেশ দাশকে সম্বোধন করছি, তাঁর প্রাসঙ্গিকতার অনুরোধ আমি কীভাবে বুঝতে শিখেছি, সেটা ক্ষমা-প্রার্থনায় তাঁকে জানিয়ে। মনঃসমীক্ষাকে বাঙালি তথা ভারতীয় স্বার্থের মধ্যে কিছুটা ঢোকানো হয়, যেমন গিরীন বোস অথবা সুধীর কক্কর। যেমন আমার সহকর্মী অধ্যাপক যারুশালমী চেষ্টা করেছিলেন মনঃসমীক্ষায় ফ্রয়েডের ইহুদিত্ব প্রমাণ করতে।

যুগের ধর্মে এবং পেশাগত বিষয় ও সময়ের গণ্ডিতে পড়েছি বলে, অবিনির্মাণের দ্বারা নিজে প্রভাবিত বলে এবং নারীবাদী বলেও, অনেকদিন ধরে মনোযোগের সঙ্গে মনঃসমীক্ষার পুঁথিপত্র পড়ে আসছি। কাজেই আপনাদের কাছে নিবেদন করছি গত অক্টোবরে সুইডেনে মার্ক্সিস্ট-ফেমিনিস্ট কংগ্রেসকে যে কর্তব্যের ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। হয়তো দুর্বোধ্য হবে, আবার দুর্বোধ্য না-ও হতে পারে, একটু ধৈর্য ধরে শুনবেন। আমি আমার ইংরেজিটা বাংলা করছি; আত্ম-উদ্ধৃতি:

> এবারে আমি আমার কঠিনতম দায়িত্বের সম্মুখীন হব। কেননা মার্ক্সিস্টদের কাছে সবসময় সাইকো-অ্যানালিস্টদের কথা তোলাটা একটু বিপজ্জনক। আপনাদের

অনুরোধ করব, মানে মার্ক্সিস্ট-ফেমিনিস্টদের, মার্ক্সবাদ আর মনঃসমীক্ষার ঝগড়া এড়িয়ে চলতে। মনঃসমীক্ষার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি ঠিক কি ভুল, এ-প্রশ্নও বর্তমানে এড়িয়ে চলুন। মনঃসমীক্ষাকে আমরা মার্ক্স-এর ক্যাপিটালের তৃতীয় খণ্ডে অবস্থিত অতি পর্যাপ্ত এবং অপরীক্ষিত মানবতাবাদী 'realm of freedom' অথবা 'স্বাধীনতার দেশ', যা সমাজ সংস্কারের আওতার বাইরে, সেটাকে মার্ক্সবাদের শেষ সীমা বলে ধরে নিতে অনুরোধ করব। মেনে নিন যে নিজের ক্ষমতার সীমা অবগত হলে, কাজ মজবুত হয়— সর্বত্র এই আমার বক্তব্য; যা শিখেছি দীর্ঘ জীবনে, অন্যের কাজে লাগবার অন্তহীন চেষ্টায়। মার্ক্স-এর স্বাধীনতার রাজ্যকে আমরা নতুন করে ভাবি অন্ত-সমীক্ষার অধিমানসিক অর্থাৎ 'metapsychological' হিসেবে— মনের যে-অংশটিকে আমরা মনের মাধ্যমে বুঝতে পারি না সেই অংশের মানবতাবাদী বর্ণনা মার্ক্স দিয়েছেন। সেখানে সহজে যেতে পারে না শিক্ষক একাকী, কিন্তু সেই অংশটিকেই আমাদের টেনে নিয়ে আসতে হবে মন যেখানে প্রবেশ করতে পারে সেই জায়গায় (অধিমানসিকের সঙ্গে একটা

সম্পর্কহীন সম্পর্ক মনে রেখে) এবং সেখানে গড়তে হবে ন্যায়সঙ্গত সমাজস্থাপনার ইচ্ছে। Meta-psychological-এর টানাহ্যাঁচড়ায় psychologically available করতে হবে। এ-নিয়ে বহু কথা বলা যায়। অধুনা লিঙ্গ-ধারণার বিশাল উন্মোচনে মনের এই অংশটি চেতনা-বিপ্লবের ছাড়পত্র পেয়েছে, যাতে করে আমরা রাষ্ট্র, বিশ্ব-রাজনীতি, পার্টির রাজনীতি, এবং গোলকায়নের পরস্পরবিরোধী বহু দোটানা অথবা double bind নিয়ে সক্রিয় হতে পারি।

ইংরেজিটা বাংলায় অনুবাদ করবার জন্য লিখিনি। কাজেই ইংরেজিটাও আপনাদের পড়ে শোনাই:

> I come now to the hardest part of my responsibility. I must ask us to avoid all the conflict between psychoanalysis and Marxism. Let us avoid the attempts to prove the historically marked conclusions of psychoanalysis right or wrong. Let us relate it to Marx's inadequate humanistic intuition of a realm of freedom that social engineering cannot reach in that well-known powerful passage in Capital

volume 3 and aknowledge it as the limit of Marxism. Let us also acknowledge that to recognize a limit to one's powers produces a better practice – my basic point everywhere, a lesson learned in a long life trying to be useful. Let us rethink Marx's intuition of a realm of freedom as the space of the meta-psychological which can be accessed by a single teacher only hesitantly, yet that is the space which we must persistently try dragging into the psychological (with a relationship without relationship to the meta-psychological) to produce a will for social justice. The new opening up of gendering has made this space an extremely important concurrent space of revolution in consciousness which must go with ways to negotiate the double bind between the nation state, geopolitics and party politics; and globality.

বড়ো শক্ত শোনাচ্ছে। কাজটাও শক্ত। মনকে যদি computer ধরেন, তবে meta-psychological অথবা অধিমানসিক হল programming যেখানে হয়। মাইনে করা শিক্ষক মনকে program করে ন্যায়সঙ্গত জগৎকে

চাওয়া ঢোকায় সেই অধিমনে। সে কি কম কথা! গণ্ডগ্রামে ধরুন, শিশুমনের ভিজে সিমেন্টে আঁচড় কেটে, আর বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ-রূপকের সাধারণীকরণে। এর চেয়ে বেশি বোঝাতে হলে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। আর একসঙ্গে কাজ করতে হলে অনেক দেখেশুনে লোক ধরতে হয়। যে শুধু ওপর থেকে দয়াবৃষ্টি করবে না। অপরাশক্তির ব্যায়াম করতে শিখতে পারবে।

মার্ক্স-এর 'দর্শনের দুর্দশা'-র মামুলি সমালোচনা হচ্ছে, প্রবন্ধটিতে খালি অর্থনৈতিক কথা, দর্শনের কথা কিছু নেই। অর্থনীতিকে বস্তুবাদী দর্শন বলে অভিহিত করতে এবং বুঝতে আমাদের মনপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করতে হবে। মানুষ এবং উচ্চস্তরের প্রাণী, প্রাচীন অর্থে প্রজা, যা দরকার তার থেকে বেশি তৈরি করতে পারে। এই আমাদের জীবগোষ্ঠীর বস্তুবাদী সংজ্ঞা— প্রয়োজন ও নির্মাণ-ক্ষমতার তফাত। সেই তফাত থেকে অনেক কিছু বেরোয়, শিল্পকলা, প্রেম, মৃতের স্মৃতিপালন, ইত্যাদি, এবং পুঁজিও। তার যথাযথ ব্যবহারে সমাজবাদ, আত্মসাতে পুঁজিবাদ। যথাক্রমে সুনীতি এবং লোভ। এবং এই সুনীতিকে বজায় রাখতে হলে অপরাশক্তির ব্যায়াম; যেহেতু লোভ স্বাভাবিক। তাই আজ বস্তুবাদী সুনীতির কর্তব্য হচ্ছে গোলকায়িত বিশ্ব এবং দেশ-রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে পুঁজি-নিয়ন্ত্রণের আইনগুলি জানা এবং

সেইখানে দাবি রাখা, বস্তুবাদী সুনীতির কর্তব্য। সারদা দেবী যখন বলেন: 'জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।'— তখন এই প্রতিষ্ঠানে অশিক্ষিতা অসাধারণ জগৎবাদিনী নারীর উক্তিকে আমরা এই বস্তুবাদী সুনীতিতে সাধারণীকরণ করতে পারি, তিনি প্রথাগত ভগবৎবাদকে কীভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন, সেটা বোঝবার চেষ্টা করে, সহানুভূতি দিয়ে। সবসময়ে পুরুষের মন্ত্রজপ কেন করব? তবে মনে থাকে, এই শিক্ষা অমানুষিক। জগৎহন্তা মানুষের নাম বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছে, মনুষ্যত্ব অথবা humanism-এর নামে নৃত্য-গীত করবার প্রবৃত্তি আমার নেই।

এবার বিশ্ব থেকে কুঁকড়ে গণ্ডগ্রামে এসে বক্তব্য শেষ করি। এই দেখুন আমার একটি শিক্ষিকা। কখনো ট্রেনে চড়েনি। একে হয়তো নন্দন-এ দেখিয়েছিলাম, আবার দেখুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[একটি ভিডিয়ো দেখানো হয়, যেখানে মাধ্যমিক পাস কাকলি মণ্ডল, পাঁচ-বছর ধরে গ্রামের ছোটো ছেলে-মেয়েদের পড়ানোর মধ্য দিয়ে তিনি কী শিখেছেন, এই প্রশ্নের জবাবে অনেকক্ষণ ভাবার পর বলেন, অন্যের ছেলে-মেয়েকে কী করে নিজের ছেলে-মেয়ের মতো মানুষ করতে হয়, এইটা তিনি শিখেছেন।]

ভেবে দেখুন, ট্রেনে চড়েনি কোনোদিন, সুতরাং এই অভিজ্ঞতা তো তার নতুন। ও যা বলল, তাতে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হলাম।

মা-র নবজাতকের প্রতি অনুরাগ অপরাশক্তির একটি ঘরোয়া আভাস দেয়। সুতরাং, অপরের সন্তানকে সেইভাবে ভালোবাসার নির্দেশ, অপরাশক্তিকে নীতির মধ্যে এনে গণতন্ত্রের রহস্য ভেদ করবার প্রশিক্ষণ বলা যেতে পারে। আর শিক্ষিকা হৃদয়ঙ্গম করেছে, কত বড়ো কথা! কিন্তু বলা আর করা কি এক? talk the talk, walk the walk কি এক? ওপরের দিকের ছাত্ররাও বড়ো বড়ো কথা বলতে পারে। করে কী?

কিছুদিন বাদে ইস্কুলে কয়েকটি সাঁওতাল ছাত্র-ছাত্রী এল। এই কাকলি তাদের পড়াতে এগোতে পারল না। অনেক বলা-কওয়ার পর এখন কিছুটা মন দিতে পারছে। কিন্তু অন্য SC ছাত্ররা কি পারছে? আর আমি SC কথাটা ব্যবহার করি, কারণ তারা নিজেরা SC বলে নিজেদের, ST-র থেকে পৃথক করার জন্য। কোথাও কোথাও ওরা-আমরা মিশে গেছে। মানে ওরা ভেবেচিন্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে না, চিন্তায় বিভাগ করে না। কিন্তু যে প্রচলন ধরে চলেছে, তার মধ্যে যে যতরকম আছে, বাউরি আর বাগদি, লোহার আর খয়রা— ভাগও আছে, আবার অসম্ভব দুর্দশার মধ্যে পড়ে আছে, এমনও আছে। এগুলি ওখানে নেমে কে দেখে? কিন্তু অন্য ST ছাত্ররা কি পারছে, এই সাঁওতালদের সঙ্গে এক হতে? আমার পুরুলিয়ার জোনাড়া গ্রামের ছাত্রী শ্যামলী শবরকে যখন কলকাতায় নিবেদিতা ইস্কুলে দেব বলে খোঁজ করেছিলাম, তখন অধ্যক্ষা ঠিকই বলেছিলেন: 'টিভি দেখেনি, ফ্লাশের টয়লেট দেখেনি, জানলার কাচ দেখেনি, চেয়ার-টেবিল দেখেনি, জলের কল দেখেনি— একে নিয়ে অন্য বাচ্চারা এত হাসাহাসি করবে, ওর মানসিক সমস্যা হতে পারে। ফিরিয়ে নিন।' এখানে তথাকথিত স্বাভাবিক চিন্তার দুর্দশা। আর যখন সরকার বলে 'সাঁওতালরা হিন্দু', যখন কয়েক লাখ টাকায় প্রাইমারি স্কুলের চাকরি বিক্রি হয়, যখন সব নিম্নবর্গের ছাত্রকে পাশ করিয়ে দিয়ে সাক্ষরতার পরিসংখ্যানকে অবান্তর করে দেয়া হয়, NGO-রা দেয় আয় উৎপাদনের শিক্ষা, নইলে স্কুল-বাড়ি বানিয়ে আর বই দিয়ে খালাস হয়, তখন চিন্তার অবলুপ্তি, চালাকির রাজত্ব। নিম্নবর্গের শিক্ষার তরল মল বেরিয়ে যাচ্ছে দেশের গুহ্যদ্বার দিয়ে। আর মফস্বল ও রাজধানীর উচ্চশিক্ষার খবর তো আপনারাই জানেন, চিন্তা যাতে দুর্দশাগ্রস্ত থাকে, তার

কত চেষ্টা। এখানে শ্মুয়েল আইসেনস্টাট ম্যাক্স ওয়েবারকে নবীকরণ করে যাকে বলেছেন— neo-patrimonial state— অর্থাৎ আইনসম্মতভাবে (আইন বদলিয়ে বদলিয়ে অবশ্যই) আমলাবাদের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুবিধানিয়োগ— সেই সরকার-ব্যবস্থার হাতে মার খেয়ে যাচ্ছি আমরা। এটাকেই আমি নন্দন-এর বক্তৃতায় ভোটের কল বলেছিলাম। সুতরাং তিনটে ভিন্ন প্রসঙ্গের চিন্তাকে সক্রিয়ভাবে, বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে, একাকার করতে আমাদের পারতে হবে। এক) শিক্ষার প্রাঙ্গণে আমাদের এই অতি-প্রাসঙ্গিক চিন্তার গ্লানির ফর্দ, যেটা আমি এক্ষুনি দিলাম, দুই) গোলকায়িত পুঁজিকে নিয়ন্ত্রণ করবার আইনকে আমাদের দুর্দশা দূরের দাবির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত করা এবং তিন) নিম্ন ও উচ্চবর্গের রূপকাত্মিক শিক্ষার শক্ত কাজে আত্মনিয়োগ— এইটা আমাদের কাজ। এই হচ্ছে আনন্দযজ্ঞে নিমন্ত্রণ। এই নিমন্ত্রণ আমরা রক্ষা করতে পারব না আজকে। হবে না, কিন্তু হবে বলে এগোব, যোগদান করুন। দল বেঁধেও নয়, একা একাও নয়, দলীয়ভাবে যাচাই করতে করতে, ভুল থেকে শিখতে শিখতে। ধন্য আশা কুহকিনী। অথবা মায়াবিনী— মায়া শব্দটিকে আমি বিরাট ও বিস্তৃত অর্থে 'fiction' বলে অনুবাদ করেছি। 'illusion' নয়। নইলে কি আমাদের মা-দুর্গা 'বিষ্ণুমায়া' হতে পারতেন। আর সেই মায়া, যাতে করে পুরুষ

ছাড়া আর-কেউ অসুর বধ করতে পারে, তার পুজোয় আমাদের কী বলানো হয়েছে? যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ... সুতরাং ভুলের ওপর দাঁড়ানো শুধু ফরাসি উচ্চতত্ত্ব নয়। আমি ফরাসিও নই, হিন্দুও নই। ফরাসি পড়েছি, হিন্দু জন্মেছি। ভ্রান্তির শিক্ষা ঠেকে শিখেছি।

সংক্ষিপ্ত সার: প্রাসঙ্গিককে স্বার্থ থেকে অপরে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান। মার্ক্স-এর 'দর্শনের দুর্দশা'-কে অনুপ্রাণ বলে স্বীকার। ই. পি. টমসন-এর 'তত্ত্বের দুর্দশা'-র আলোচনায় যুক্তি আছে, কল্পনার স্বীকৃতি নেই। শঙ্খ ঘোষকে শিখণ্ডী ধরে সাধারণ-অসাধারণের বিভক্ত বুদ্ধিকে একাকার করবার অনুরোধ, রূপকের ক্ষমতা। রবীন্দ্রনাথ ও সারদামণি চট্টোপাধ্যায়ের দুই ধরনের অসাধারণত্বকে সম্মান। ইরিগারায়ের 'মনঃসমীক্ষার দুর্দশা'-র আলোচনা— লিঙ্গভেদ রক্ষা করে মানুষকে একাকার করায় গণতন্ত্রের রহস্যভেদের ইঙ্গিত— মনঃসমীক্ষা নিয়ে আমার দুটি কথা--- অর্থনীতিকে বস্তুবাদী দর্শন বলে ধরা--- পশ্চিমবঙ্গে নিম্নবর্গের শিক্ষা সম্বন্ধে মনের দুঃখে সংযম হারানো— সব মিলিয়ে অমানুষিক অপরা শক্তির বন্দনা এবং হবে না, তাও হবে--- এই ভুল ধারণাকে জেনে-বুঝে অবলম্বন করা। আমার কথাটি ফুরোল।

না, একেবারে ফুরোল না। পুনশ্চতে বলে যাই,

রোহিঙ্গাদের কথা একটু ভাববেন। জাতিসংঘ অবধি বলেছে যে তাদের মেয়েদের বীভৎসভাবে ধর্ষণ করা গণহত্যার হাতিয়ার। আর আমরা ভারতে উদ্‌বাস্তু রোহিঙ্গাদের সেই ভয়ংকর গহ্বরে ফেরত পাঠিয়েছি। বিশ্বজুড়ে অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার এবং রোহিঙ্গাদের নিরাপদ অর্থাৎ কড়া পাহারাসম্বলিত একটা থাকার জায়গা সংগ্রহ করা নিয়ে আন্দোলন চলছে, তাতে আমি অবশ্যই যোগ দিই। কিন্তু আমার ইচ্ছে, ওরা যাতে সাবলীল গণতান্ত্রিক শিক্ষার চৌকাঠে অন্তত পা ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাচ্চাগুলো, বড়ো মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা হয়েছে ওদের, মুমূর্ষু চিন্তার অন্ধকারে বড়ো হচ্ছে। উদ্‌বাস্তু ওরা, একটা শান্ত ছবি দেখিয়ে আমি শেষ করি। সামনের মহিলার মুখটি তার দেশের দিকে ঘুরোনো।

নমস্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদ পরিক্রমা

প্রণবেশ সেন

সময়টা কেমন গোলমেলে। মেজাজটা বুঝে ওঠা ভার। মিলতে চায় না কোনো হিসেবই। কথা আর কাজ, সাধ আর সাধ্য, স্বপ্ন আর বাস্তব— প্রত্যেকের মাঝখানে হাইফেনগুলো দীর্ঘ হতে হতে এমন একটা প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে, যেখান থেকে এপার-ওপার দেখা যায় না। আর তাতেই কিনা জানি না, প্রত্যেকেরই মন, কেমন যেন সুরে বাজে না।

এই ক-দিন আগে আসছিলাম অফিসে। পথে অনেক মানুষের ভিড়। সবাই কাছাকাছি, প্রায় লাগালাগিও। তবুও কাউকে দেখছি, কাউকে দেখেও দেখছি না। আবার কাউকে একেবারেই দেখছি না। দৃষ্টিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা ছোট্ট সীমায় ঘুরপাক খায়। হঠাৎ সামনে পড়লেন এক বন্ধু। চোখ পড়তেই হেসে প্রশ্ন করলেন— এই যে! কেমন আছেন? উত্তরে 'এই চলছে কোনোরকম' বলতে গিয়েই দেখি প্রশ্নকর্তা কিছুটা এগিয়ে গেছেন। আমার পা-ও থমকে থাকেনি। দায়সারা ওই সংলাপ আঁচড় কাটল ভাবনার বুকে। কী দরকার ছিল বন্ধুটির ওই প্রশ্নের, আমার ওই 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি'-উত্তরের। কারোরই তো সময় নেই দাঁড়াবার। ভাবনাটাকে চায়ের পেয়ালায় চিনি নাড়ার মতো নাড়তে চাড়তে গিয়ে হঠাৎ মনে হল— আমরা বুঝি মরে গেছি। প্রত্যাশার অভাব— তাই তো মৃত্যু— হৃদয়ের মৃত্যু— সমবেদনার মৃত্যু— ভালোবাসার মৃত্যু।

কেন জানি না মনে হয়, এই 'হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মৃত্যু'-র চেয়ে এই মৃত্যু আরো সাংঘাতিক। প্রথম মৃত্যুটা তো নিজের। কিন্তু নিহত হৃদয়ের হাতে শিকার হয় আর পাঁচজন। অথচ মানুষ হিসেবে আমাদের বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্তই হল, মানুষের জন্য এবং মানুষের মধ্যে বাঁচা। সেই কোন আদ্যিকালে কারা যেন বলতেন, আমরা এক থেকেই বহু হয়েছি— তাই খণ্ডাংশের মধ্যে রয়েছে 'এক' হবার আকুতি। আর ওই আকুতিটারই বাস্তব প্রকাশ নাকি মানুষের সমাজ-জীবন। সমাজ তো তাই— যেখানে সবাই সমানভাবে মিলবে। ব্যাপারটা কিন্তু তা ঘটল না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরই কেউ কেউ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে, যারা পিছিয়ে পড়ে রইল,

তাদের দিকে না তাকানোয়, সমাজে বৈষম্যের সৃষ্টি হল। অসুস্থতা দেখা দিল। আর এই বৈষম্যময় সমাজেরই বড়ো অসুখ সহানুভূতি ও সমবেদনার অবক্ষয়। সেই যে জীবনানন্দ লিখেছিলেন:

> যদিও পথ আছে, তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
> নায়ক, সাধক, রাষ্ট্র, সমাজ, ক্লান্ত হয়ে পড়ে,
> প্রতিটি প্রাণ, অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মত
> কি এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব সাগরে।

সব আছে। হাত-পা-চোখ-কান-মুখ। শুধু হৃদয়টি খোয়া গেছে। আর ওই হৃদয়ের 'না থাকা'-র মানে, যে-সাড়ার জন্য মানুষের এত কান্না, সেই সাড়াই না-জাগা।

> ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হয়ে তাই,
> আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
> আমার এ বিস্ময়, বিস্ময়ের ঠাঁই
> নক্ষত্রের থেকে এলো? তুমি জেগে নাই।

সেই যে সে প্রেম— যাকে নিয়ে আমরা এত খেলি, হাসি, কাঁদি, ঘর সাজাই, মহল বানাই— তা-ও কি চিরদিন থাকে? কখনো কি ক্ষয়ে যায় না? কখনো কি মনে হয় না— 'পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে।'— তারও আত্মসমর্পণ আছে, শেষ আছে।

একদিন এক রাত ক'রেছি প্রেমের সাথে খেলা
এক রাত এক দিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা,
সবাই চলিয়া যায়—সকলের যেতে হয় বলে
তাহারো ফুরালো রাত তাড়াতাড়ি পড়ে গেল বেলা
প্রেমেরও যে।

তাহলে কি সবটাই হতাশা? বাঁচা মানে কি নিজেরই শবদেহ বয়ে নিয়ে বেড়ানো? বোধহয় না।

আরো এক আলো আছে, দেহে তার বিকেল বেলার
ধূসরতা,
চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে
আছে স্থির।

ওই স্থির আলোই আমাদের কাঙ্ক্ষিত। আজকাল তো আমরা কত কিছু শিখছি, কত কিছু জানছি। কিন্তু প্রায়ই দেখছি সেই শেখায় শেখায়, জানায় জানায় বিরোধ বাধছে, সংঘর্ষ ঘটছে। আমরা ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি, টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছি। অথচ যাকে আমরা জ্ঞান বলি, তা কিন্তু খণ্ডিত নয়, বিচ্ছিন্ন নয়। বরং বলব, তার মূল সুরটি মিলিয়ে নেওয়ার, সমন্বয়ের। এই সমন্বয়ের সুরটি হয়তো আজ আমরা শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু একদিন পাব। আর ওই পাওয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠবে এক নূতন মূল্যবোধ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে? অনেক ঘুমের ঘোরে
ভরিবে কি মন সেদিন তোমার!
তোমার আকাশ—আলো, জীবনের ধার,
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?
আমার বুকের 'পরে, সেই রাতে জমেছে যে শিশিরের
জল
তুমি কি চেয়েছিলে শুধু তাই! শুধু তার স্বাদ
তোমারে কি শান্তি দেবে!
আমি চলে যাব,—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেই দিন, পৃথিবীর 'পরে;—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!

তাহলে তো আশ্রয় আছে! আশ্রয় থাকা মানেই তো ভালোবাসা থাকা, হৃদয়ের বেঁচে থাকা। যাকে যেমনভাবে জানি, যাকে যেমনভাবে চিনি— তাকে ঠিক জানি, ঠিক চিনি, ঠিক বুঝি—এমন একটা বিশ্বাস যদি আমরা সবাই পেয়ে যাই, তবে আমরা সবাই বেঁচে যাব। দেবেন কেউ—সেই বিশ্বাস ফিরিয়ে—যেখানে 'ঝোড়ো হাওয়া আর পোড়ো বাড়ীটার ভাঙা দরজাটা' মিলে যায়, সহাবস্থান ঘটে।

প্রচার তারিখ: ১৯ মার্চ ১৯৮০